THE IMPRESSION, A Journal on Multidisciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
VOL. X, Annual Issue (2023) (ISSN: 2278-2699)

নজরুল চর্চার প্রাসঙ্গিকতা

সারদা মাহাতো*

সারসংক্ষেপঃ *বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন নজরুল ইসলাম।সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল।কাব্য, সংগীত, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস সব রচনায় সমান দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। নজরুল ইসলামের জীবনদর্শন,অসাম্প্রাদায়িক চেতনা, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নানা চিত্র আমরা তাঁর লেখনীর মধ্যে উপস্থাপিত হতে দেখি।এই কারণে তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়ে থাকে । এই বিশেষণ দিয়ে নজরুল ইসলামকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। তিনি একজন বাস্তববাদী কবি। একাধারে তিনি প্রেমের কবি। মানবতার কথা তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক নানা অসাম্যের বিরুদ্ধে কবি প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর সময়কাল আর বর্তমানের সময়কাল এক নয়। দুই কালের ব্যবধান থাকা সত্বেও নজরুল ইসলাম আজও সমান প্রাসঙ্গিক। তাঁর রচনার মধ্যে সম্প্রীতির চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যের মূল কথা সাম্যবাদ। সব ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন বলেই ধর্মান্ধতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হননি। মুক্ত মনে তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন।*

সূচক শব্দঃ *বিদ্রোহী; মানবতা; ধর্মরাজের দম্ভ; হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব; কেতন; শাণ-শওকত; পার্থসারথি; পিণাক-পাণি।*

মূলপ্রবন্ধঃ নজরুল ইসলাম বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।খুব ছোটবেলায় পিতৃহীন হন। সংসারের হাল ধরতে ‘লেটো’র দলে যোগদান করেন। নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর কিছুদিন গ্রামের মক্তবে শিক্ষকতা করেন। তারপরে আসানসোলে রুটির দোকানে কাজ নেন। সেখানকার থানার দারোগা রফিজউদ্দিন সাহেব তাঁকে ভর্তি করে দেন ত্রিশালের দরিরামপুর হাইস্কুলে।একবছর পড়াশোনা করার পর তিনি চলে আসেন চুরুলিয়ায় । ভর্তি হন রানীগঞ্জের শিয়ারসোল রাজ স্কুলে।তিন বছর পড়াশোনা করেন। এইসময় যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল।১৯১৭ সালে ৪৯ নম্বর পল্টনে যোগদান করেন।তিন বছর সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তাঁর চাকুরি জীবন মূলত ছিল করাচিতে।এইসময় তাঁকে পেশোয়ার, নওশেরা,বেলুচিস্তান যেতে হয়েছিল। সেনাবাহিনীতে অল্পসময়ের মধ্যে প্রথমে হাবিলদার ও পরে ব্যাটেলিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৯২০ সালে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে সৈনিক জীবন সমাপ্ত হয়। করাচিতে থাকাকালিন ১৯১৯ সালে তাঁর প্রথম গল্প ‘বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী’, ‘সওগাত’ পত্রিকায় ১৩২৬ সংখ্যায় এবং প্রথম কবিতা ‘মুক্তি’ বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের শেষে নজরুল চলে আসেন কলকাতায়। এর পর তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোযোগী হন। ১৯২২ সালে তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘বিদ্রোহী’ প্রকাশিত হয় ‘বিজলী’ ও ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায়। তাঁকে সবাই এরপর থেকে বিদ্রোহী’ কবির আখ্যা দেয়।‘ধূমকেতু’ পত্রিকা সম্পাদনা করার অপরাধে ইংরেজ সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি আবারও সাহিত্য সৃষ্টির কাজে মন দেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো ‘অগ্নি-বীণা’, ‘বিষের বাঁশী’, সাম্যবাদী, সর্বহারা, প্রলয়-শিখা। এ ছাড়াও অসংখ্য গান রচনা করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সহযোগিতায় , ১৯৭২ সালের ২৪ মে তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৭৪ সালে ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট এবং বাংলাদেশ সরকার থেকে ১৯৭৬ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে ‘একুশে পদক’ প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ সালে ২৯ আগস্ট ঢাকাতে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
E - Mail Id: saradam@rbu.ac.in

করেন।রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কবিকে সমাধিস্থ করা হয়।

নজরুল ইসলামকে বর্তমান সময়ে আমরা কেন পড়বো তার উত্তর খুঁজতে আমাদের চলে যেতে হবে তাঁর সাহিত্য সৃজনের সময়টাতে। যদিও তার সময়কাল আর বর্তমান সময়কাল এক নয়।তবুও আজও নজরুল ইসলাম চর্চা করা হচ্ছে। কারণটা তাঁর সাহিত্য ভাবনার দিকে তাকালে বুঝতে পারা যাবে । নজরুল ইসলাম সাম্যবাদী কবি । মানবতাবাদী কবি। তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন।জন্মসূত্রে ইসলামী রীতিনীতি জেনেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে কীর্তন, কথকথা, যাত্রাগান, পবিত্র কোরান পাঠ ও ব্যাখ্যার প্রতি প্রবল আগ্রহ তৈরি হয় । যে কারণে ছোটবেলা থেকে নজরুল ইসলামের মানসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে ।সব ধর্মের প্রতি সমান অনুরাগ পরবর্তীকালে তাঁকে মানব ধর্মে দীক্ষিত করতে সাহায্য করেছিল। বাউল, সন্ন্যাসীদের সঙ্গ লাভ করায় নজরুল ইসলামের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রখর বুদ্ধি ও মেধার অধিকারী ছিলেন নজরুল ইসলাম। হাইস্কুলে পড়ার সময় প্রধান শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিককে । পড়াশোনা করার ফাঁকে কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে । ১৯২২ সালে 'আনন্দময়ীর আগমনে' লেখার জন্য কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হন। সাত মাস জেল খেটেছিলেন । ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষজনের সাহচর্যে আসার কারণে অসাম্প্রদায়িক ভাবনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আজীবন তিনি সম্প্রীতি রক্ষার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল এক জটিল সময়ে, সেইসময়ে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সুনজরে দেখা হতো না। যে কারণে নানা সমস্যার মধ্যে তাঁকে পড়তে হয়েছিল।তবুও তিনি হার মানেননি। নিজের বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন আজীবন।

নজরুল ইসলামের ব্যক্তি- জীবন ও সাহিত্য জীবন দেখলেই আমরা দেখতে পাবো একজন প্রথাভাঙ্গা ব্যতিক্রমী মানুষকে প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবনচর্চার কোনোটাতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না । যে কারণে তাঁকে 'কাফের' ,'যবন' নামে ভূষিত করা হয়েছিল। তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন প্রমীলা দেবীকে। সন্তানদের নাম রেখেছিলেন কাজী কৃষ্ণ মহম্মদ, কাজী অরিন্দম খালেদ,কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ। নিজের জীবনাচরণের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন অসাম্প্রদায়িক মনোভাব।প্রচলিত ধর্মের চেয়ে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন মানবধর্মকে। ১৯২০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ২২ বছর তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন । এই কয়েক বছরে কবিতা , প্রবন্ধে গানে বাঙালি জাতিকে মাতিয়ে রেখেছিলেন।বাঙালির রবীন্দ্রপ্রীতির কথা আমরা জানি । কিন্তু ওই সময়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে নজরুল ইসলাম বেশ জনপ্রিয়। সাম্যবাদী ও সংগ্রামী চেতনা, তাঁর লেখায় বারে বারে প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে তিনি যেমন বিদ্রোহী কবি, প্রেমের কবি অন্যদিকে ইসলামী গান কৃষ্ণ ভজনা, শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন। যিনি 'আল্লা ব'লে কাঁদ বারেক রসূল বলে কাঁদ'। তিনিই লিখেছেন- 'এসো মুরলীধারী বৃন্দাবনচারী গোপাল গিরিধারী শ্যাম'। কিংবা 'শ্যাম নামের লাগল আগুন আমার দেহের ধূপকাঠিতে'।
(নজরুল- সংগীত সংগ্রহ- রসিদূর নবী সম্পাদিত, নজরুল ইন্সটিটিউট ,ঢাকা ২০১৪ , পৃষ্ঠা ৩৪০,৩৪২, ৯২৬)

কীভাবে একজনের মনের মধ্যে কালী- কৃষ্ণ আল্লার সমন্বয় ঘটতে পারে এবং তাহলে কী হতে পারে তার দৃষ্টান্ত নজরুল ইসলামের সমগ্র জীবন । মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের পাশে বসে যিনি হাফিজ অনুবাদ করেন। তিনি আবার অসুস্থ স্ত্রীকে সুস্থ করার জন্য যোগী বরদাচরণ মজুমদারের কাছে ছুটে যান। তাঁর চরিত্রের এই বৈচিত্র্য আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে দেয়। তাই নজরুল ইসলামকে বুঝতে হলে তার চরিত্রের এই দিক বিশ্লেষণ না করলে পরিপূর্ণ নজরুল ইসলামকে আমরা খুঁজে পাব না।

নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের সময়টা ছিল অস্থির। রাজনৈতিক সামাজিক সব মিলিয়ে জটিল এক সময় । এই সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম সীমায় পৌঁছায়। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক নানা বিভাজন । এইরকম সংকটকালে নজরুল ইসলাম জাতীয় শৃঙ্খল মোচনের জন্য কলম ধরলেন । তেমনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব বজায় থাকে সেদিকেও নজর দিলেন। সকল ধর্ম,বর্ণ সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার কথা শোনালেন ।বর্তমান সময়ে আমরা ধর্মের নামে নানা বিভাজন দেখতে পাই। নজরুল ইসলামের কবিতা গানে যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন সেদিকে তাকালে বুঝতে অসুবিধা থাকে না তাঁর

উদ্দেশ্য কী ছিল। সচেতন ভাবে তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থে উপমা, রূপক ব্যবহার করেছেন।

"আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ।
আমি বজ্র, আমি ঈশান- বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার,
আমি পিণাক -পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচন্ড!"১

হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে কবি কম করতে চেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে অনেক কবি-সাহিত্যিক আরবি- ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ করেছেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সেইসময় হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল যা কাঙ্ক্ষিত ছিল না। কবি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। একজন কবি তিনি হিন্দুও নন মুসলমানও নন তিনি শুধু কবি। তাই তিনি যেমন ইসলামি সংঙ্গীত লিখতে পারেন তেমনি শ্যামাসংগীত , বৈষ্ণবগীতিও রচনা করেন। সমস্ত ভেদাভেদের ঊর্দ্ধে উঠতে পেরেছিলেন তিনি । হিন্দু- মুসলমানের পূর্ণ মিলনে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই মুসলিম হয়েও তাঁর কাব্যে হিন্দু দেব-দেবীরা স্থান পায়।

স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমরা ধর্মের নামে হানাহানি মারামারি করে চলেছি । ভারতবর্ষের যে প্রাচীন আদর্শ তা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি । ধর্মকে কেন্দ্র করে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী মানুষদের অর্থলিপ্সা সমাজকে কলুষিত করে চলেছে। এই ধর্ম ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে নজরুল মন্তব্য করেন –

"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান,
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"২

প্রবন্ধের মধ্যেও সোচ্চারে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ের এমন ভাবনা খুব কম জনের লেখায় ধ্বণিত হয়েছে-

> "এসো ভাই হিন্দু! এসো মুসলমান! এসো বৌদ্ধ! এসো ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখো, পাশে তোমাদের মহা শয়নে শায়িত ওই বীর ভ্রাতৃগণের শব। ওই গোরস্থান-ওই শ্মশানভূমিতে-শোনো শোনো তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ পবিত্র স্থানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই।" ৩

মানুষে মানুষে কোনো বিভাজন থাকা উচিত নয়।সব ধর্মের মানুষকে এক হতে হবে তবেই আমাদের মুক্তি সম্ভব।হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধ তৈরী করা হয়েছে ।এক শ্রেণীর মানুষ এই বিভাজনের মাধ্যমে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেন। তাই কবি সকল মানুষদের কাছে আবেদন করেছেন নিজেদের মধ্যে যত স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে, কলহ আছে তা মিটিয়ে নিতে। সমাজে যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলেছে ধর্মযাজকগণ তাদের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। 'হিন্দু

মুসলমান' প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবনা ব্যক্ত করেছেন-

> "হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব দুই-ই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয় , ওটা হয়ত পন্ডিত্ব, তেমনি দাড়ি ও ইসলামত্ব নয় ওটা মোল্লাত্ব! আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লার মারামারি, হিন্দু-মুসলমানের মারামারি নয়।"৪

বর্তমান সময়ে তাঁর এই বক্তব্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না । প্রবন্ধের পাশাপাশি তাঁর 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' কবিতার কথা বলা যেতে পারে। যেখানে তিনি এই ধর্ম ব্যবসায়ীদের চক্রান্তের কারণে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের রক্তে ধর্মের মোহকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে আজ ধর্মের খেলায় বুঁদ হয়ে আছে যে জাতি তাদের উদ্দেশ্যে সোচ্চারে বলেন –

> "মরিছে হিন্দু, মরে মুসলিম এ উহার ঘায়ে আজ,
> বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ মরণে নাহি লাজ।
> জেগেছে শক্তি, তাই হানাহানি,
> অস্ত্রে অস্ত্রে নব জানাজানি ।
> আজি পরীক্ষা কাহারে দস্ত হয়েছে কত দরাজ !
> কে মরিবে কাল সম্মুখ- রণে, মরিতে কারা নারাজ ।"৫

ভাই ভায়ের বুকে আঘাত হানছে। উন্মত্ত জনতা তাদের ভালো-মন্দ বুঝতে পারছে না। কিন্তু কবি এতসবের মধ্যেও আশার বাণী শুনিয়েছেন-

> "যে- লাঠিতে আজ টুঁটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির –চূড়া
> সে লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া!
> প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে –রণ,
> চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
> করুক কলহ-জেগেছে তো তবু- বিজয়- কেতন উড়া!" ৬

চির কল্যাণকামী মানুষদের আবির্ভাবে সমস্ত অশুভ শক্তি পরাস্ত হবে, আশাবাদী কবি। আমরাও আশাবাদী এই সময়ের পরিবর্তন হবে, জনজাগরণের মাধ্যমে । নজরুল ইসলাম 'মন্দির মসজিদ' প্রবন্ধে বলেছেন-

"মার শালা যবনদের'। 'মারো শালা কাফেরদের' । আবার হিন্দু-মুসলমানি কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি , তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম -তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না ।হিন্দু -মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে- 'বাবা গো, মা গো'! মাতৃ পরিতক্ত দুটি ভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে। দেখিলাম, হত- আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদি চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।

মন্দির- মসজিদের ললাটে লেখা এই রক্তকলঙ্ক রেখাকে মুছিয়া ফেলিবে বীর? ভবিষ্যৎ তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে! সেই রুদ্র আসিতেছেন। যিনি ধর্ম-মাতালদের আড্ডা ওই মন্দির- মসজিদ- গির্জা ভাঙিয়া সকল মানুষকে এক আকাশের গম্বুজ তলে লইয়া আসিবেন"।৭

এত বছর পরেও ধর্মব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ হয়নি যত দিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে আমরা অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করছি। এখনো হিন্দু -মুসলমানের মধ্যে ধর্মকে কেন্দ্র করে কত সংঘাত। যদিও মুক্তিকামী মানুষ ধর্মের বেড়াজাল ছিন্ন করতে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। তবুও আজও মুক্তি আসেনি । নজরুল ইসলাম তাঁর সমগ্র জীবনে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সর্ব ধর্মের সমন্বয় সাধন করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চিয়ান সব জাতির মানুষজন সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবার মন্ত্র লিখে গেছেন ।ক্ষুদ্র স্বার্থকে উপেক্ষা করে মানব মন্ত্রের জয়গান গাইতে হবে। তবে আমাদের মত মানুষের মুক্তি লাভ সম্ভব। হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই হয়ে না থাকলে আমাদের চিরন্তন মানবতা ভূলুণ্ঠিত হবে। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি করতে হলে সংকীর্ণ জাতপাতের উর্ধ্বে উঠতে হবে। নজরুল ইসলাম আজীবন মানুষের কথা বলেছেন। স্বার্থান্বেষী মানুষের বিরুদ্ধে তার কলম শাণিত তরবারি ।'মন্দির মসজিদ' প্রবন্ধে বলেন-

> "স্রষ্টার আপনি মোড়ল 'প্রাইভেট সেক্রেটারি' রা হ্যাট খুলিয়া, টুপি তুলিয়া টিকি নাচাইয়া আমায় তাড়না করিবে, তবু ইহাদের পতন হইবে । ইহারা ধর্ম মাতাল।ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই,শাস্ত্রের অ্যালকোহল পান করিয়াছে"।৮

এত সোচ্চারে ধর্মের মোহ সম্মন্ধে খুব মানুষ লিখেছেন। নজরুল ইসলামের অধিকাংশ লেখাতেই ধর্মের গোঁড়ামি, ভন্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে , এই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারেননি নজরুল ইসলাম। তিনি মনে করেন একশ্রেণীর মানুষ আর এক শ্রেণীর মানুষকে কি করে শোষণ করতে পারে! দরিদ্র কৃষক যে ফসল ফলায় শ্রমিক যে শ্রম দেয়, এই শ্রেণীর মানুষরা সমাজকে সচল রেখেছেন। অথচ এই শ্রেণীর মানুষরা সমাজে সব থেকে বেশি অবহেলিত শোষিত হন । সমাজের এই বিষয়টি তাঁকে অবাক করেছে। তাই তিনি বলেন -"এমন করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বলা"।

সমাজে সমতার ভীষণ দরকার । সেটা না থাকলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ।যত দিন গেছে তত এই বৈষম্য বেড়েছে। আসলে নজরুল ইসলাম শোষিতের দর্পণে নিজেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । স্বাধীনতা বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, সকল শ্রেণীর সমানাধিকার। ধর্মীয় গোঁড়ামি, অস্পৃশ্যতা সাম্প্রদায়িকতা নজরুল ইসলামকে পীড়িত করেছিল । জাতের নামে বজ্জাতি করে জাতিভেদের নাম করে মানুষে মানুষে যারা বিভাজন তৈরি করছে, তাদের জন্য ধিক্কার জানিয়েছেন-

> যাহারা গুন্ডা, ভণ্ড, তারাই ধর্মের আবরণে
> স্বার্থের লোভে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে অজ্ঞান জনগণে।
> জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ এরা আনি।
> আপনার পেট ভরায়, তখত চায় এরা শয়তানী।
> ধর্ম -আন্দোলনের ছদ্মবেশে এরা কুৎসিত,
> বলে এরা, হয়ে মন্ত্রী,করিবে স্বধর্মীদের হিত।৯

মানুষের সৃষ্টি বিভাজন নজরুল ইসলাম মেনে নিতে পারেননি। আমাদের দেশে বা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাধকগণ যেমন শান্তির বাণী শুনিয়েছেন, নজরুল ইসলাম তেমনি শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন তাঁর লেখার মাধ্যমে। ঈশ্বর জগতে সব স্থানে বিরাজ করেন । সর্ব মানবের মাঝে তাঁর অধিষ্ঠান। চৈতন্যদেব থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা দিয়েছেন। এঁদের ভাবনাকে নজরুল ইসলামের বক্তব্যের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই-

"কোথা তুই খুঁজিস ভগবান, সে যে রে তোরই মাঝে রয়,
চেয়ে দেখ সে তোরই মাঝে রয়।
সাজিয়া যোগী ও দরবেশ খুঁজিস যায় পাহাড় জঙ্গলময়।।
আঁখি খোল ইচ্ছা -অন্ধের দল নিজেরে দেখ রে আয়নাতে,
দেখিবি তোরই এই দেহে নিরাকার তাঁহার পরিচয়।।
ভাবিস তুই ক্ষুদ্র কলেবর, ইহাতেই অসীম নীলাম্বর,
এ দেহের আধারে গোপন রহে সে বিশ্ব- চরাচর ।
প্রাণে তোর প্রাণের ঠাকুর বেহেশতে স্বর্গে কোথাও নয়।।
এই তোর মন্দির- মসজিদ এই তোর কাশী -বৃন্দাবন ,
আপনার পানে ফিরে চল কোথা তুই তীর্থে যাবি, মন!
এই তোর মক্কা-মদিনা,জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয়।।"১০

নজরুল ইসলাম সত্য- সুন্দরের জয়গান গেয়েছিলেন। তিনি সর্বদাই চেয়েছিলেন ইসলামের সাম্য- মৈত্রীর ভাবনা বিশ্বজনমানসের সাথে সম্মিলিত হোক নিবিড় ভাবে । একটি মুক্ত বিশ্ব চেতনা গড়ে তুলবার কথা ব্যক্ত করেছিলেন।

"ইয়া আল্লাহ, তুমি রক্ষা কর দুনিয়া ও দ্বীন ।
শান -শওকতে হোক পূর্ণ আবার নিখিল মুসলেমিন" ।১১

ইসলামে স্থির বিশ্বাস রেখেও অকুণ্ঠ চিত্তে বৈষ্ণবদের মতোই কৃষ্ণ ভজনা করতে পারেন।

জয় নরনারায়ণ জয় পার্থ সারথি।
সর্ব কালের সর্বলোকে যাঁর আরতি।
যে কৃষ্ণ নাম জপেন ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর
যে নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুরনর
এই অসীম বিশ্ব সীমা যাঁহার পায় নাকো খুঁজি
থাকে জীবনে মরনে যেন সেই পদে মতি
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি । ১২

তাঁর বিভিন্ন গানে আমরা দেখতে পাই সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের ছবি। কবি নজরুল সার্বজনীন কবি হয়ে ওঠেন। তাঁর কাছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কিংবা জিবরাইল-মিকাইল- ইসরাফিল এক হয়ে যায়।ধর্মের সবরকমের গোঁড়ামিকে অগ্রাহ্য করে সোচ্চারে বলেছিলেন-

"আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্টান, আমি বৌদ্ধ,
আমি ব্রাহ্ম। আমি তো কোনো ধর্মের বাইরের খোলসটাকে
ধরে নেই"। ১৩

নজরুল ইসলাম মন থেকে অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা করতেন বলেই, আজীবন নিরপেক্ষ থাকতে পেরেছিলেন। বর্তমান সময়ে যাঁরা নিরপেক্ষ বলে নিজেদের দাবি করে আসলে তারা অনেকেই সুযোগ সন্ধানী। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলে নিরপেক্ষতার মুখোশ খসে পড়ে। নিজেদেরকে সংস্কারের ঊর্ধে তুলে ধরতে পারছে না। নীতিহীন, আদর্শহীন আজকের এই অশান্ত সময়ে নজরুল ইসলাম চর্চা আরও বেশি করে প্রয়োজন। পথভ্রষ্ট নবীন প্রজন্মকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারেন তিনি। বর্তমান সময়ে তাঁর সৃষ্টিসম্ভারকে অনুশীলন করা অতি আবশ্যক বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১ । কাজী নজরুল ইসলাম,' বিদ্রোহী','অগ্নিবীণা,' 'নজরুল- রচনাবলী', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ ২০০৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯

২ । 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র' , 'মানুষ' দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃ.৭৪

৩। কাজ়ী নজরুল ইসলাম, 'নবযুগ', 'যুগবাণী', রচনাসমগ্র প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী,দ্বিতীয় সংস্করণ মার্চ ২০০৫, পৃ. ৪১৭

৪ । কাজীনজরুলইসলাম, 'হিন্দু-মুসলমান' , 'রুদ্রমঙ্গল', নজরুল -রচনাবলী,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ ২০০৭। দ্বিতীয় খন্ড ,পৃষ্ঠা ৪৩৭

৫। কাজী নজরুল ইসলাম; 'হিন্দু -মুসলিম যুদ্ধ'; ফণি-মনসা','সঞ্চিতা', ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৪০৬, পৃ. ১২

৬। কাজী নজরুল ইসলাম , 'হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ', 'ফণিমনসা' নজরুল রচনাবলী , বাংলা একাডেমী, ঢাকা ,জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ২০০৭, পৃ. ৬৭

৭। কাজীনজরুলইসলাম, ''মন্দির ও মসজিদ' , 'রুদ্রমঙ্গল', নজরুল -রচনাবলী,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ ২০০৭। দ্বিতীয় খন্ড ,পৃষ্ঠা ৪৩১-৪৩২

৮। তদেব, পৃ. ৪৩২

৯। কাজী নজরুল ইসলাম 'সু নির্বাচিত কবিতা' , ' গোঁড়ামি ধর্ম নয়' , সাহিত্যম, কলিকাতা, নভেম্বর ১৯৭০ পৃ. ২৩৫

১০। রশিদূর নবী সম্পাদিত, 'নজরুল সংগীত সংগ্রহ' , নজরুল ইনস্টিটিউট ,ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩৭২-৩৭৩'

১১। কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র' , দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃ .৯৩৭

১২। রশিদূর নবী সম্পাদিত, 'নজরুল সংগীত সংগ্রহ' , নজরুল ইনস্টিটিউট ,ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৯৩৭

১৩। 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র' দ্বিতীয় খন্ড , পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ৩৫৯

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. আসরফি খাতুন, রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল , এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১২

২. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম: কবিমানস ও কবিতা, রত্নাবলী, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৩

৩. রশিদূর নবী সম্পাদিত , নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, অক্টোবর ২০১৪

৪. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল- চরিত মানস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৭

৫. কাজী নজরুল ইসলামঃ জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা ২০০০

৬. চিন্ময় চৌধুরী , অন্দরের নজরুল বাইরের নজরুল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৯৯

৭. বাঁধন সেনগুপ্ত, নানা প্রসঙ্গে নজরুল, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, বইমেলা ২০০৪

৮. জীবনানন্দ দাশঃ নজরুল ইসলাম 'জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, জানুয়ারি ২০১৪

৯. আতাউর রহমান, নজরুল কাব্যসমীক্ষা, শুভ্রা প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৮

১০. কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, রফিকুল ইসলাম, কে পি বাকচী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা ১৯৯১